গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৭ বর্ষ ৪০ সংখ্যা | ১৬ - ২২ মে ২০২৫ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে শান্তি স্থাপনকারীর ভূমিকা নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হল কেন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১০ মে এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির সংবাদ উভয় দেশের জনগণকেই স্বস্তি দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হল, দুই দেশ বিষয়টি নিজেদের মধ্যে নিষ্পত্তি না করে কেন যুদ্ধবাজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যারা প্যালেস্টাইনকে ধ্বংসের উদ্দেশ্যে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে ইহুদিবাদী ইজরায়েলকে সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে সাহায্য করছে, তাদের ভারত-পাক যুদ্ধে শান্তিস্থাপনকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিল?

যুদ্ধে শুধু সম্পত্তিহানি হয় তাই নয়, বহু সংখ্যক মানুষ ও শিশুর প্রাণহানি ঘটে, এ বারও তা ঘটেছে। বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, তা হল, যে সন্ত্রাসবাদীরা পহেলগাঁওয়ে নিরীহ পর্যটকদের নৃশংস ভাবে খুন করল, আজও তারা কেউ ধরা পড়েনি এবং শাস্তিও পায়নি। এর আগেও ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কয়েক বার যুদ্ধ হয়েছে, সার্জিকাল স্ট্রাইকও হয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটেনি। এ বার যে মিলিটারি স্ট্রাইক হল, তাতে কী নিশ্চয়তা আছে যে সন্ত্রাসবাদ স্থায়ী ভাবে নির্মূল হবে? দুই দেশের শাসক কায়েমী স্বার্থবাদীরা চায় দুই দেশের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ-উত্তেজনা বাড়ুক। কিন্তু সাধারণ মানুষ, যারা যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তারা তা চায় না। আমরা উভয় দেশের জনগণের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, সন্ত্রাসবাদকে চিরতরে নির্মূল করার লক্ষ্যে এবং যুদ্ধ-ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলুন।

সন্ত্রাসবাদীদের রুখতে পারে দুই দেশের জনগণের ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য

আপাতত শান্তি ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত জুড়ে। যুদ্ধ বিরতিতে উভয় দেশের সাধারণ মানুষ স্বস্তি পেয়েছেন। যদিও এই শান্তির মেয়াদ কত দিন জানা নেই। চার দিনের যুদ্ধেই শিশু সহ বেশ কিছু মানুষের প্রাণ গিয়েছে সীমান্তের দুই পারেই। বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়েছে, প্রাণ বাঁচাতে বহু পরিবারকে ঘরবাড়ি ছেড়ে আশ্রয় শিবিরে যেতে হয়েছে। তাঁরা কবে স্বাভাবিক জীবনে ফিরবেন তার নিশ্চয়তা নেই। পাকিস্তানের হাতে বন্দি বিএসএফ জওয়ান কবে বাড়ি ফিরবেন তারও কোনও নিশ্চয়তা পাচ্ছেন না তাঁর স্ত্রী। যুদ্ধে সম্পত্তি এবং প্রাণ যায় সাধারণ মানুষেরই— যে কোনও যুদ্ধের জন্যই এটা সত্য। এই যুদ্ধেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু পহেলগাঁওয়ে সাধারণ পর্যটকদের ঠাণ্ডা মাথায় খুন করল যে সন্ত্রাসবাদীরা তাদের খুঁজে বার করা এবং শাস্তি দেওয়ার বিষয়টির কী হল? যুদ্ধের ডামাডোলে কি চাপা পড়ে গেল এই প্রশ্নটাই!

প্রশ্ন আরও থাকছে— এই যুদ্ধবিরতি প্রসঙ্গে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে। ভারত সরকারের ঘোষণার আগেই ট্রাম্প সাহেব যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে দিলেন কী করে? যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সারা দুনিয়াতে যুদ্ধ-ব্যবসার মূল হোতা, যারা প্যালেস্টাইনকে ধ্বংস করার কাজে ইজরায়েলকে অস্ত্র এবং অর্থ দুই-ই জুগিয়ে চলেছে, তারা হঠাৎ ভারত-পাক যুদ্ধ বন্ধে এত উদ্যোগী কী করে হল— তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থাকছেই। মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বিদেশ সচিব জানিয়ে দিয়েছেন, ভারত এবং

দুয়ের পাতায় দেখুন

শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষায় এসইউসিআই(সি) সহ দশটি বামপন্থী দলের যৌথ মিছিল। ধর্মতলার লেনিন মূর্তি থেকে শিয়ালদহ। ১৩ মে

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র আন্দোলনের জয়

৭ মে এআইডিএসও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিটের পক্ষ থেকে সমস্ত ক্যাম্পাসে জেরক্স এবং প্রিন্টিং সেন্টার চালু, আলিপুর ক্যাম্পাসে শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তি স্থাপন, সব ক্যান্টিনে স্বল্পমূল্যে গুণমানসম্পন্ন খাবার, সব শৌচালয় পরিষ্কার রাখা, পানীয় জলের মেশিন ও লিফট সারানো, সব ক্যাম্পাসে হেলথ সেন্টার চালু ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার দাবিতে রেজিস্ট্রারকে ঘেরাও করা হয়। ছাত্র বিক্ষোভের চাপে কর্তৃপক্ষ ৫ দফা দাবি মেনে লিখিত নোটিশ দিয়ে ঘোষণা করেন, মে মাসের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হবে। সংগঠনের কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড মিজানুর রহমান বলেন, 'এই জয় এআইডিএসও-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের জয়। আন্দোলনকারী সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাই। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে শামিল হওয়ার আহ্বান করছি।'

২০ মে সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর আহ্বান

দশটি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম শ্রমজীবী মানুষ এবং সকল শোষিত নিপীড়িত জনগণের কাছে ২০ মে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সফল করার আহ্বান জানিয়েছে। সংযুক্ত কিসান মোর্চাও এই ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সমর্থন জানিয়েছে। শ্রমজীবী মানুষের জীবনের জরুরি এবং ন্যায়সঙ্গত দাবিগুলিতে লড়াই তীব্র করার জন্যই এই ধর্মঘট। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে শ্রমিকদের দীর্ঘ লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অর্জিত ২৯টি শ্রম আইন প্রত্যাহার করে শ্রমিক স্বার্থবিরোধী, একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষাকারী ৪টি শ্রম কোড চালু করতে। এই ধর্মঘট শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রম কোড বাতিলের দাবি তুলেছে। এই ধর্মঘটের আরও দাবি— সরকারি সংস্থার বেসরকারিকরণ বন্ধ করা, 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন'-এর নামে ঘুরপথে বেসরকারিকরণের হীন কৌশল বাতিল করা, নতুন বিদ্যুৎ বিল-২০২৩ বাতিল এবং স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করা। দাবি উঠেছে, কর্ম সময় বাড়ানো চলবে না, ৮ ঘণ্টার কর্মদিবস এবং সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টা শ্রমসময় সুনিশ্চিত করতে হবে, স্থায়ী কর্মী কমানো চলবে না, কর্মীস্বার্থ বিরোধী 'জাতীয় পেনশন স্কিম' (এনপিএস)/ ইউনিফায়েড পেনশন স্কিম (ইউপিএস) বাতিল করে 'নন কন্ট্রিবিউটরি পেনশন' ফিরিয়ে এনে 'পুরনো পেনশন স্কিম' (ওপিএস) চালু করতে হবে ও সমস্ত কর্মচারীকে নিঃশর্তে তার আওতায় আনতে হবে। সমস্ত কাজকে কন্ট্র্যাকচুয়াল করার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে, 'ফিক্সড টার্ম এমপ্লয়মেন্ট'-এর মাধ্যমে কাজ হাসিল হলেই কর্মীদের ছাঁটাই করার নিষ্ঠুর ব্যবস্থা বাতিল করতে হবে। দাবি উঠেছে, সমস্ত স্কিম কর্মীদের সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি ও উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিকের নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং ন্যায্য মজুরি ও স্থায়ী কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করতে হবে। সমস্ত

সাতের পাতায় দেখুন

চাই ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য

একের পাতার পর

পাকিস্তান একত্রে আলোচনায় বসবে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আবার বলেছেন, কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে তিনি সাহায্য করবেন এবং তিনি দুই দেশেই বাণিজ্য বাড়াতে আগ্রহী। তিনি বলেছেন, 'আমি গর্বিত যে আমেরিকা আপনাদের এই সাহসী ও নায়কোচিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করেছে' (আনন্দবাজার পত্রিকা ১২ মে '২৫)। তা হলে দেখা যাচ্ছে, ভারত এবং পাকিস্তান উভয় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের কর্ণধাররা নিজেদের মধ্যে আলোচনার পরিবর্তে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ ডোনাল্ড ট্রাম্পকে এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক বিষয়ে সরাসরি নাক গলাতে সুযোগ করে দিয়েছেন। ট্রাম্প সাহেব কাশ্মীর নিয়ে আলোচনাতেও নাক গলাতে আগ্রহী। আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে এই সুযোগকে কাজে লাগাবে, যা শান্তি নয়, উত্তেজনাই বাড়াতে সাহায্য করবে। ভারতের জনগণের দীর্ঘ দিনের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী

শান্তির দাবিতে লন্ডনে
ভারতীয় ও পাকিস্তানী নাগরিকরা একসাথে পথে নেমেছেন

অবস্থানের সাথে কোনও মতেই তা সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

প্রশ্ন আরও থাকছে। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়ে থাকলে তা কতটুকু পূরিত হল? এর আগেও সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার কথা বলে যুদ্ধ হয়েছে, সে যুদ্ধ কখনও মার্কিন সরকার করেছে আফগানিস্তানে, কখনও ভারত করেছে পাকিস্তানে, কিন্তু সন্ত্রাসবাদের গায়ে কতটা আঁচড় কাটা গেছে? সন্ত্রাসবাদীদের হাতে ২৫ জন পর্যটক ও ১ জন স্থানীয় মানুষকে হত্যার সাম্প্রতিক ঘটনা— সাধারণ ভারতবাসীর মধ্যে প্রবল যন্ত্রণা এবং ক্ষোভ তৈরি করেছে। কিন্তু এর আগেও ২০১৯-এ পুলওয়ামাতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ৪৪ জন সেনার মৃত্যু, ২০১৬-তে উরিতে সন্ত্রাসবাদী হামলা, ২০১৮-তে 'রাইজিং কাশ্মীর' পত্রিকার সম্পাদককে হত্যা ছাড়াও প্রতি বছরই একাধিক সন্ত্রাসবাদী হামলা এবং সামরিক বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী কিংবা সাধারণ মানুষের মৃত্যু ঘটেই চলেছে। এ ছাড়াও কার্গিল যুদ্ধ সহ একাধিক ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়েছে, ভারতের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে জঙ্গি ঘাঁটি ধ্বংসে একাধিক সার্জিকাল স্ট্রাইক হয়েছে। এ বারেও পহেলগাঁও হামলার পরেই পাকিস্তানের একাধিক জায়গায় ভারতীয় সেনা জঙ্গি ঘাঁটি হিসাবে চিহ্নিত করে কিছু ইমারতে ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ করেছে। মানুষকে সরকার বুঝিয়েছে সন্ত্রাসবাদ এতে নির্মূল হবে। কিন্তু সত্যিই এই লক্ষ্য কতটা অর্জিত হল তা ঠাণ্ডা মাথায় নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করা দরকার।

দেখা যাচ্ছে ভারত এবং পাকিস্তান উভয় দেশের শাসকের দিক থেকে এই লড়াইগুলির সাথে বেশি জড়িয়ে আছে আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বাধ্যবাধকতা। পাকিস্তানের জনসাধারণের তীব্র দারিদ্র, দেশটির অর্থনৈতিকভাবে প্রায় দেউলিয়া হওয়ার বিরুদ্ধে সে দেশের জনগণের তীব্র ক্ষোভকে অন্য দিকে চালিত করার জন্য সে দেশের কায়েমি স্বার্থের প্রতিভূ শাসক বুর্জোয়া শ্রেণির সেবাদাসদের প্রধান হাতিয়ার ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদের মোহে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রাখা। এই কাজে তাদের প্রয়োজন ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসাবে তুলে ধরে প্রবল ভারত বিরোধিতার জিগির তোলা। এটাই তাদের রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডাগুলির একেবারে প্রথম সারিতে আছে। অন্য দিকে, ভারতের শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির দলগুলিও বিশেষত বর্তমান শাসক বিজেপি একই ভাবে শোষণের মূল কারণ থেকে মানুষের দৃষ্টি সরিয়ে দিতে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসার এবং দেশ জুড়ে মুসলিম বিরোধী মানসিকতা প্রসারে ব্যস্ত। এই কাজ করতে গিয়ে তাদের হাতিয়ার উগ্র পাকিস্তান বিরোধিতা। পহেলগাঁও হামলার পরেও দেখা গেছে সারা দেশ জুড়ে বিজেপির প্রধান চেষ্টা ছিল সামগ্রিকভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে সন্ত্রাসবাদের হোতা বলে দাগিয়ে দিয়ে হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক সংহত করা। যদিও সারা দেশের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ তাদের এই চক্রান্তে পা দেননি। তাঁরা ঐক্য সংহতি বিনষ্ট হতে দেননি। সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ এবং ঘৃণা নিয়ে মানুষ দাবি তুলেছেন, অবিলম্বে এই সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার ও তাদের সর্বোচ্চ শাস্তির ব্যবস্থা করার কাজে কোনও ঢিলে দেওয়া চলবে না। কাশ্মীরের জনগণ যাঁদের অধিকাংশই মুসলিম ধর্মাবলম্বী, তাঁরা ব্যাপক সংখ্যায় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বনধ পালন করেছেন। তাঁরা এই জঘন্য অপরাধীদের চরম শাস্তি চেয়েছেন। আবার সন্ত্রাসবাদী হানায় প্রাণ হারানো সেনা অফিসারের স্ত্রী কাশ্মীরের জনগণ ও মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে বিষোদগার বন্ধ করতে আবেদন জানিয়ে সাম্প্রদায়িক বিষাক্ত চিন্তার ধারকদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। মানুষ প্রশ্ন তুলেছে, সন্ত্রাসবাদীরা যদি ধর্ম জেনে খুন করে জঘন্য অপরাধ করে থাকে, যারা ধর্মের ভিত্তিতেই বিষাক্ত বিভেদ ছড়িয়ে মুসলিম বিরোধী জিগির তুলছেন তাঁরা কি একই মানসিকতার শিকার নন? পুলওয়ামার হামলার পরেও একই দাবি মানুষ তুলেছিল, এই সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করে তাদের পরিচয় দেশের মানুষের কাছে প্রকাশ করা হোক, তাদের কঠোরতম শাস্তি হোক। কিন্তু তা হয়নি, প্রধানমন্ত্রী সার্জিকাল স্ট্রাইকের কৃতিত্ব নিয়েছেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের ধরার কী হল, সে প্রশ্ন অমীমাংসিতই থেকে গেছে। মৌলবাদী চিন্তার জঠরে যে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয় তার বীজ পাকিস্তানের মাটিতে যেমন আছে, ভারতেও কম নেই। এ ক্ষেত্রে উগ্র ইসলামী মতবাদ কিংবা উগ্র হিন্দুত্ববাদ এর কোনওটির ভূমিকাই কম নয়। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে দুই দিকের উগ্র ধর্মান্ধতা ও মৌলবাদী চিন্তার বিরুদ্ধেই লড়তে হবে। পাকিস্তানের উগ্র ইসলামী মতবাদের পৃষ্ঠপোষকরা যেমন এই কাজ করতে অক্ষম, তেমনই হিন্দুত্ববাদের কারবারি বিজেপিও কি তা পারে? যে কারণে মালেগাঁও বিস্ফোরণের মতো সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের সাথে যুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞা বিজেপির নেতায় পরিণত হন! ভারত পাকিস্তান উভয় দেশের হিন্দু-মুসলিম মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি পরস্পরের পরিপূরক— এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। যত বিজেপি হিন্দুত্ববাদের জিগির তোলে, তত মুসলিম মৌলবাদের জিগির তুলতে অপর পক্ষের সুবিধা হয়। আবার পাকিস্তানী শাসকরা মৌলবাদ-সন্ত্রাসবাদের জিগির তুললে এ দেশের হিন্দুত্ববাদের পালে হাওয়া লাগে। আরও প্রশ্ন থাকে, পাকিস্তান, আফগানিস্তান সহ মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সমস্ত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর স্রষ্টা এবং মদতদাতা মার্কিন শাসকরাই। সেই শক্তির মধ্যস্থতায় সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সম্ভব? ভারত সরকার পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে আফগানিস্তানের যে তালিবান শাসকদের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়াচ্ছে, তারা কারা? সন্ত্রাসবাদী এবং মৌলবাদী নয়?

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কোনও সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকই আজ যথার্থ আন্তরিক নয়। মার্কিন শাসকরা তো কোনও

সাতের পাতায় দেখুন

জীবনাবসান

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় এসইউসিআই(সি)-র বারুইপুর সাংগঠনিক জেলার চুপড়িঝাড়া লোকাল কমিটির সদস্য কমরেড কার্তিক নস্কর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৫ এপ্রিল ৭৪ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

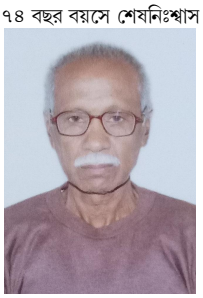

১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের সময় তিনি কমরেড প্রবোধ পুরকাইতের মাধ্যমে জননেতা কমরেড ধীরেন ভাণ্ডারীর সাহচর্যে দলের সাথে যুক্ত হন। শুরুতে ভাগচাষিদের আন্দোলন সহ নানা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। সাধারণ মানুষ এস ইউ সি আই (সি) দলের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে দেখে তা প্রতিহত করতে নেমে পড়ে সিপিএম-কংগ্রেস। তাদের যৌথ চক্রান্তে বিধায়ক কমরেড প্রবোধ পুরকাইত সহ ১১ জনের মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন জেল হয়। এই মামলায় কমরেড কার্তিক নস্করেরও জেল হয়। জেল জীবনেও কমরেড কার্তিক নস্কর দলের অন্য বন্দিদের সাথে নিয়মিত দলের আদর্শ চর্চা করতেন। দীর্ঘ ২৩ বছর পর যখন জেল থেকে মুক্তি পান, ততদিনে তিনি শারীরিক ভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন। কিন্তু ওই অবস্থাতেও তিনি নিয়মিত দলের খোঁজখবর রাখতেন।

তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান কমরেড অনিরুদ্ধ হালদার, কমরেড গোবিন্দ হালদার ও কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদারের পক্ষে কমরেড নিত্য হালদার। ৮ মে রাধাবল্লভপুরে তাঁর স্মরণসভা হয়। সভাপতি ছিলেন কমরেড পুলিন নস্কর। বক্তব্য রাখেন কমরেড সৌরভ মুখার্জী, কমরেড গোবিন্দ হালদার, কমরেড বাঁশীনাথ গায়েন ও ইউসুফ গায়েন।

কমরেড কার্তিক নস্কর লাল সেলাম

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় দলের ডায়মন্ডহারবার সাংগঠনিক জেলার গাববেড়িয়া লোকাল সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কমরেড নিতাই হালদার ৬৬ বছর বয়সে ১৪ মার্চ নিজের বাড়িতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯৬৭ সালে নির্বাচনে কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। দিনমজুর ঘরে দারিদ্রের মধ্যেও পার্টি পরিচালিত গণআন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার পাশাপাশি প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি ও পাশ-ফেল চালুর আন্দোলন ও পার্টি পরিচালিত বিভিন্ন আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে থাকেন। পারিবারিক সমস্যার মধ্যেও পার্টি পরিচালিত কর্মসূচি রূপায়ণে নিজেকে যুক্ত রাখার নিরলস সংগ্রাম করেন। 'কমরেড শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা অনুশীলন কেন্দ্র' গড়ে তোলার সময় নেতৃত্বের নির্দেশে ঘাটশিলায় বেশ কিছুদিন ছিলেন। ওই সময়ে অস্থায়ী যে কাজ করতেন তা চলে যায়। এ বিষয়ে কোনও অভিযোগ তাঁর ছিল না। সম্প্রতি পরিবারে দুর্ঘটনাজনিত মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগে তাঁর শরীরের অবনতি হচ্ছিল। তা সত্ত্বেও লোকাল অফিস ও গণদাবীর দায়িত্ব নিয়ে কাজ করছিলেন। তাঁর মৃত্যুসংবাদে এলাকার কর্মী সমর্থক সহ শুভানুধ্যায়ীরা সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা জানান।

১১ এপ্রিল রামেশ্বরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শ্যামল প্রামাণিক, কমরেড বিশ্বনাথ সরদার এবং কমরেড কনক সরদার। সভাপতিত্ব করেন কমরেড সমরেন্দু রায়।

কমরেড নিতাই হালদার লাল সেলাম

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের সংগ্রাম থেকে

শ্রেণিগত চেতনা অর্জনই যথার্থ শিক্ষা

৯ মে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে রাশিয়া, চিন সহ বেশ কিছু দেশের শীর্ষ নেতারা সমবেত হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েত লালফৌজের হাতে হিটলারের নাৎসি বাহিনীর পরাজয়ের ৮০তম বর্ষপূর্তি উদযাপন করলেন। সমারোহ দেখে কারও মনে হতে পারে, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের যে বিজয় এই দিনটিতে ঘোষিত হয়েছিল, এই সব নেতারা বোধহয় সেই ঐতিহ্যকেই বহন করছেন। সে দিন সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের নেতৃত্বে আক্রমণ নিছক একটি দেশের বিরুদ্ধে আক্রমণ ছিল না, তা ছিল সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ। সেই সময়কার সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মী সহ ২ কোটি সাধারণ মানুষের প্রাণ ও অপরিমেয় ধ্বংসের বিনিময়ে ফ্যাসিস্ট বাহিনীকে পরাজিত করে শুধু রাশিয়া নয়, গোটা ইউরোপকে রক্ষা করেছিল স্ট্যালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া। আজ যাঁরা সেই বিজয় দিবস উদযাপন করলেন তাঁরা কি সত্যিই সেই ঐতিহ্যের উত্তরসূরি?

বাস্তবে সকলেই জানেন, বহু বছর আগেই এই দেশগুলি সমাজতন্ত্র পরিত্যাগ করে পুঁজিবাদী পথের পথিক হয়েছেন। রাশিয়া, চিন দুই দেশেই প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত। দুই দেশই ইতিমধ্যে সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে। রাশিয়ায় সে কাজটি মূলত পুতিনের হাত দিয়েই হয়েছে, ঠিক যেমন চিনে তা শি জিং পিনের হাত ধরে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যে যুদ্ধ তা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু নয়। তা হলে এই সব রাষ্ট্রপ্রধানরা বিজয় দিবসের এই উদযাপনে কেন? আসলে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে পরিত্যাগ করলেও এই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে, ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয়কে কেন্দ্র করে রাশিয়ার সাধারণ মানুষের, বিশ্বের দেশে দেশে শোষিত মানুষের যে আবেগ এখনও অটুট রয়েছে, নিজ নিজ দেশে ক্ষমতা অটুট রাখতে, এই যুদ্ধে জনগণের সর্বাত্মক সমর্থন পেতে জনগণের সেই আবেগটি তাঁদের প্রয়োজন। এর বেশি কিছু নয়। তাই উদযাপনের এই বিরাট সমারোহে বিজয়ের প্রধান কারিগর, সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের নির্মাতা জোসেফ স্ট্যালিনের উল্লেখ কোথাও নেই। কারণ স্ট্যালিন মানে সমাজতন্ত্র। স্ট্যালিন মানে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা। স্ট্যালিন মানে শোষণহীন সমাজের লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। স্বাভাবিক ভাবেই পুতিনের রাশিয়াতে কিংবা জিং পিনের চিনে খোঁজ মিলবে না বিজয় দিবসের যথার্থ তাৎপর্যের। সেই তাৎপর্যের সন্ধানে একবার পিছন ফিরে তাকানো যাক।

১৯৪৫ সালের ৮ মে বার্লিনের উপকণ্ঠে সোভিয়েট লালফৌজের কাছে জার্মানির ফ্যাসিস্ট সামরিক চক্রের চূড়ান্ত আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে সরকারি ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষিত হয়। যদিও তার ছ'দিন আগে ২ মে রাইখস্ট্যাগে সোভিয়েট রণপতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে বার্লিনের চূড়ান্ত যুদ্ধ শেষ হয়েছিল।

১৯৪৫ থেকে ২০২৫, এই ৮০টি বছর অতিক্রান্ত হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির। এ বছর ৯ মে সারা বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী ও গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষ উদযাপন করেছে অক্ষশক্তির পরাজয়ের ৮০তম বার্ষিকী।

বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তীব্র সংকটকালে ফ্যাসিবাদের উত্থান

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আবার সংকটে পড়েছিল। যুদ্ধে পরাজিত জার্মানির সংকট তীব্র রূপ নিয়েছিল। কারণ, যুদ্ধের শেষে ইংরেজ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা জার্মানির সমস্ত কলোনি বা উপনিবেশগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। ইটালি যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসির পক্ষে যোগ দেওয়া সত্ত্বেও, তাকে কলোনির ভাগ প্রায় কিছুই দেওয়া হয়নি। ফলে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী দেশগুলোতে যে গুরুতর বাজার ও ব্যবসা সংকট দেখা দিল, তার সব চেয়ে বড় ধাক্কা পড়ল ইটালি ও জার্মানিতে। কারণ, তাদের হাতে উপনিবেশ ছিল না যেখানে মাল বিক্রি করে তারা সংকট থেকে উদ্ধার পেতে পারে। হাজারে হাজারে শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। শ্রমিক আন্দোলন তীব্র রূপ নেয়, ইটালিতে শ্রমিকরা কল-কারখানা দখল করে নেয়। পুঁজিপতি শ্রেণি তখন শ্রমিক আন্দোলনকে দমন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে শ্রমিকদের মধ্য থেকেই পুরনো এক বিশ্বাসঘাতক নেতা মুসোলিনিকে সামনে নিয়ে আসে। সে শ্রমিকদের দমন করার জন্য ধনিক শ্রেণির সাহায্যে একটি দল গড়ে তোলে যার নাম ফ্যাসিস্ট দল।

পুঁজিপতি মালিক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতায় মুসোলিনির দলের শক্তিবৃদ্ধি হতে থাকে, কিন্তু সোসাল ডেমোক্রেটিক নেতৃত্বের বিশ্বাসঘাতকতায় ইটালির শ্রমিকরা এই বিপদ ধরতে পারেনি। নেতাদের নিজেদের মধ্যে নেতৃত্ব নিয়ে খেয়োখেয়ির জন্য শ্রমিকরা ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

ফলে, ইটালিতে মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিস্টরা শ্রমিক নেতাদের হত্যা করে, কলে-কারখানায় শ্রমিকদের বিরুদ্ধে নৃশংস আক্রমণ চালিয়ে শ্রমিকদের পরাজিত করে। পুঁজিপতি শ্রেণি আনন্দিত হয়ে ফ্যাসিস্টদের হাতে দেশের সরকারি ক্ষমতা তুলে দেয়। কিন্তু শ্রমিকদের পরাজিত করার দ্বারা বাজার সংকটের কোনও সমাধান করা গেল না। কারণ, পুঁজিবাদ রইলই। ফলে, ইটালির পুঁজিপতি শ্রেণির কাছে কলোনি দখল করা ও তার জন্য ইঙ্গ-ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যুদ্ধের জরুরি প্রয়োজন দেখা দিল। যুদ্ধের প্রয়োজনেই মুসোলিনির দল দেশের মধ্যে নতুন করে উগ্র জাতীয়তাবাদ ও যুদ্ধের জিগির তুলল।

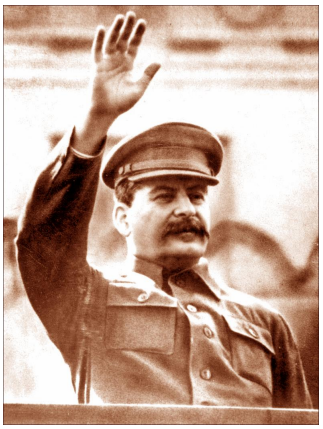

কমরেড জোসেফ স্ট্যালিন

জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের উত্থান

ইটালির মতো একই কারণে জার্মানিতেও ফ্যাসিবাদের উত্থান ঘটল। জার্মানিতে তার নাম দেওয়া হল নাৎসিবাদ যা মুসোলিনির জমানার তুলনায় আরও উগ্র, আরও বেশি বর্বর ও নৃশংস রূপ নিল। ১৯১৮ সালে জার্মানিতেও সোসাল ডেমোক্রেটিক শ্রমিক নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে শ্রমিক বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়ে যায়। ফলে পুঁজিবাদী বাজার সংকটের ধাক্কা থেকে জার্মানি বাঁচতে পারেনি। মন্দা, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি ইত্যাদি পুঁজিবাদী সংকটের সমস্ত লক্ষণই সেখানে প্রকট হতে থাকে। তার উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসাবে বিপুল পরিমাণ অর্থ ইংরেজ ও ফরাসিরা প্রতি বছর জার্মানির কাছ থেকে আদায় করে নেওয়ায় জনজীবনের দুর্দশা বেড়ে যায়। ১৯৩০ সালের প্রবল বাণিজ্য সংকট জার্মান জনজীবনে প্রচণ্ড আঘাত করে। অসন্তোষের আগুন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জার্মান শ্রমিকরা পুঁজিবাদকে ধ্বংস করার দাবি তোলে। জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণি ভীত হয়ে পড়ে। ধনিক শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দ্বন্দ্ব তীব্রতর হয়। ১৯৩১ সাল নাগাদ শ্রমিকদের সংঘবদ্ধতা এত বৃদ্ধি পায় যে, জার্মান ধনিক শ্রেণি শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে হিটলার 'জাতীয় সোসালিস্ট' (নাৎসি) নামে একটি দল খুলেছিল। জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণি হিটলারের দলের মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে ও তাকে সাহায্য করতে থাকে।

শ্রমিকদের মধ্যে অনৈক্য, ইটালির মতো জার্মানিতেও পুঁজিপতি শ্রেণি ও নাৎসিদের সহায়তা করল। হিটলার ভুয়ো সমাজতন্ত্র ও দেশের প্রগতির স্লোগানে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেও বিভ্রান্ত করতে থাকল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত জার্মানি, ইংরেজ ও ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যে ভার্সাই সন্ধি করতে বাধ্য হয়েছিল, জার্মান জনগণ তার বিরুদ্ধে স্বভাবতই বিদ্বেষ পোষণ করত। হিটলার ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে 'আন্দোলন' শুরু করল। দীর্ঘকালের কুসংস্কার থেকে ইউরোপের জনগণের মধ্যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণাভাব কাজ করত। হিটলার তাকেও কাজে লাগাল। হিটলার আওয়াজ তুলল, জার্মানির সকল দুর্দশার জন্য দায়ী হচ্ছে ভার্সাই সন্ধি, ইহুদি ও কমিউনিস্টরা। এই স্লোগানে বিভ্রান্ত করে ১৯১৯ সাল থেকেই ফ্যাসিস্টরা জার্মানিতে লোক সংগ্রহ করছিল। ১৯৩০-৩১ সালের তীব্র ব্যবসা সংকট যখন শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষের আগুন জ্বালিয়ে দিল তখন জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণি ১৯৩৩ সালে হিটলারের নাৎসি দলের হাতে জার্মানির সরকারি ক্ষমতা তুলে দিল, যাতে ফ্যাসিস্টরা সাধারণ জনমতকে বিভ্রান্ত করে শ্রমিকদের ক্ষমতা গুঁড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু শুধু এর দ্বারা জার্মান পুঁজিবাদকে সংকট থেকে মুক্ত করা সম্ভব ছিল না। ফলে, কলোনি চাই। তাই হিটলার 'জার্মান জাতির শ্রেষ্ঠত্ব' ও সমগ্র বিশ্বের উপর তার 'প্রভুত্ব করার অধিকারের' আওয়াজ তুলে যুদ্ধ প্রস্তুতি শুরু করল— যার আসল উদ্দেশ্য ছিল জার্মান পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে উপনিবেশ দখল করা।

একই ভাবে জাপানেও এক ফ্যাসিবাদী শক্তির উত্থান ঘটল। জার্মানি-ইটালি-জাপান এই তিন ফ্যাসিস্ট সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে প্রধান মিল ছিল এই যে, এদের কারওরই উপনিবেশ ছিল না। তাই উপনিবেশ দখলে একে অপরকে সাহায্য করার জন্য এই তিন শক্তি নিজেদের মধ্যে জোট বাঁধল। সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এ ভাবে বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি বা উপনিবেশ রক্ষা ও দখলের দ্বন্দ্ব থেকেই ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছিল। হিটলারের কমিউনিস্ট বা সোভিয়েট বিদ্বেষের মধ্যে গোপনীয়তা কিছু ছিল না। সে প্রকাশ্যেই কমিউনিস্ট নিধনের আওয়াজ তুলল এবং বলশেভিজমকে 'সভ্যতার শত্রু' বলে চিহ্নিত করে রাশিয়াকে ধ্বংস করার ডাক দিল। সে দিন যারা মনে করেছিল যে, হিটলারি ফ্যাসিস্ট আক্রমণ কেবল কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হবে, অচিরেই তাদের ভুল ভাঙল এবং দেখা গেল, যা কিছু সত্য সুন্দর ও শুভ, তার বিরুদ্ধেই হিটলারি খড়্গ নেমে এল।

মানবজাতিকে ফ্যাসিস্ট আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেছিল লালফৌজ

১৯৩৯ সালে জার্মান বাহিনীর দ্বারা পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারপর ফ্রান্স পশ্চিম ইউরোপ দখল করে নেওয়ার পর জার্মান বাহিনী ১৯৪১ সালের ২২ জুন আক্রমণ করল সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে। হিটলার মনে করেছিল, ফ্যাসিস্ট আক্রমণের সামনে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের প্রতিরোধ যেমন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল, ঠিক তেমনই 'দুর্বল' সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার

ছয়ের পাতায় দেখুন

মে দিবস পালন করলেন বাইক-ট্যাক্সি চালকরা

১ মে কলকাতা সাবার্বান বাইক ট্যাক্সি ইউনিয়নের চালকেরা মে দিবসের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে একটি মিছিল করে সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে সমবেত হন। সেখানে কাশ্মীরে নিহতদের স্মরণে নীরবতা পালন ও দোষীদের কঠোরতম শাস্তি দাবি করা হয়। বাইক ট্যাক্সি চালকরা যে ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন, সে সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দেন ইউনিয়নের সম্পাদক কমরেড দেবু সাউ। তিনি দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন গড়ে তোলবার আহ্বান জানান। সভায় মে দিবসের তাৎপর্য নিয়ে

আলোচনা করেন এ আই ইউ টি ইউ সি কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড আয়সানুল হক। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সভাপতি কমরেড শান্তি ঘোষ।

যোগ্য শিক্ষকদের পুনর্বহালের দাবিতে বিক্ষোভ

এসএসসি ২০১৬-র প্যানেলে ২৬ হাজার শিক্ষক বাতিলের প্রতিবাদে পথে নামল ছাত্র সমাজ। শিক্ষকদের পাশে থাকবার অঙ্গীকার নিয়ে এআইডিএসও পশ্চিম মেদিনীপুর দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে বেলদা, দাঁতন, কেশিয়াড়ি, নারায়ণগড় ব্লকের বিভিন্ন স্কুল থেকে শতাধিক ছাত্রের উপস্থিতিতে যোগ্য শিক্ষকদের সসম্মানে পুনর্বহালের দাবিতে মিছিল বেলদা কেশিয়াড়ি মোড় থেকে শুরু হয়ে বিডিও অফিসের সামনে পৌঁছে বিক্ষোভ সভা হয় ও বিডিওকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মিছিলে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি কমরেড সায়ন্তন ওঝা ও জেলা সম্পাদক কমরেড সন্দীপন জানা।

বিনামূল্যে স্বাস্থ্যশিবির

২ মে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও পিএমপিএআই-এর মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির যৌথ উদ্যোগে লালবাগ 'সুভাষচন্দ্র বসু সেন্টিনারি কলেজ' কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় কলেজ হলে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়।

শিবিরে প্রায় দেড় শতাধিক নাগরিকের হেলথ চেক আপ (হার্ট-চোখ-দাঁত-জেনারেল মেডিসিন) এবং সুগার পরীক্ষা করে বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

কলেজ অধ্যক্ষের সভাপতিত্বে ডাক্তার-প্যারামেডিকেল স্টাফ-

লালবাগ, মুর্শিদাবাদ

সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

শিক্ষকদের সংবর্ধনা জানানো হয়। বিশিষ্ট কার্ডিওলজিস্ট ও এমএসসি-র রাজ্য কোষাধ্যক্ষ ডাঃ নীলরতন নাইয়া স্বাস্থ্য সচেতনতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। অন্যান্য চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকা পালন করেন কলেজের ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও অশিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ।

সোনারপুর ঃ ১৩ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুরে মকরমপুর শিশু বিকাশ অ্যাকাডেমিতে একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ইসিজি, ব্লাড সুগার ইত্যাদি পরীক্ষা হয়। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের চিকিৎসকরা দাঁতের সমস্যা সহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করেন। প্রায় ১২০ জন রোগী চিকিৎসা পেয়ে উপকৃত হন।

বর্ধমান সিএমওএইচ-এর কাছে দাবি পেশ কমিউনিটি হেলথ গাইড ইউনিয়নের

২৯ এপ্রিল এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিটি হেলথ গাইড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ৫ দফা দাবিতে বর্ধমান পূর্ব জেলার সিএমওএইচ-এর কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। সরকারি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সিএইচজি এবং টিডি-রা স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন কাজ করেন মাত্র ৪০০ টাকা ভাতার বিনিময়ে। অর্থ দপ্তরের আদেশ অনুযায়ী টার্মিনাল বেনিফিট পাঁচ লক্ষ টাকা দেওয়া এবং মৃত অক্ষম কর্মচারীর পোষ্যকে সরকারি দপ্তরে কাজে নিয়োগ সহ পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির পক্ষে নিখিল বেরা। পূর্ব বর্ধমান জেলার চৌধুরী মোজাকব্বির হোসেন, অশোক ঘোষ, শ্যামলী মণ্ডল, মনোয়ার মল্লিক ও জীবন সরকার প্রমুখ।

জেলায় জেলায় মে দিবস উদযাপন শ্রমিকদের

দার্জিলিং ঃ ঐতিহাসিক মে দিবস উপলক্ষে ১ মে দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন সেক্টর এবং এআইইউটিইউসি-র জেলা কার্যালয়ে সভা হয়। ভ্যানচালক, আরবান আশাকর্মী, রুরাল আশাকর্মী, বিড়ি-শ্রমিক, পিটিএস, চা-বাগান ইউনিয়ন, পরিচারিকা ইউনিয়ন, পেপার মিল, ইটভাটা, মোটরভ্যান, টোটোচালক কর্মীরা মে দিবস পালন করেন।

কোর্ট মোড়ের সভায় শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন এআইইউটিইউসি-র প্রাক্তন সভাপতি কমরেড গৌতম ভট্টাচার্য। পতাকা উত্তোলন করেন জেলা সম্পাদক জয় লোধ। জেলা সভাপতি কমরেড দেবাশীষ শর্মা হাঁসখাওয়া চা-বাগানে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঘোষপুকুরে উপস্থিত ছিলেন জেলা কোষাধ্যক্ষ কমরেড কৌশিক দত্ত। আগামী ২০ মে সারা ভারত ধর্মঘটের সমর্থনে শিলিগুড়ি শহরে মিছিল হয়।

সিকিম ঃ সিকিমের সিংতামে নেপালি ধর্মশালায় এআইইউটিইউসি-র উদ্যোগে মে দিবস উদযাপিত হয়। এ আই ইউ টি ইউ সি এবং এ আই পি এফ অনুমোদিত রঙ্গিতনগর এবং তিস্তা পাঁচ নম্বর জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইউনিয়ন ও তিস্তা চার নম্বর জলবিদ্যুৎ নির্মাণ প্রকল্প থেকে ১০০-র অধিক শ্রমিক-কর্মচারী এই সভায় অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন কমরেড প্রেম অধিকারী।

তিস্তা পাঁচ নম্বর জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে কমরেড ভূমিপ্রসাদ ঢাকাল, রঙ্গিতনগর বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে কমরেড কমল ছেত্রী বক্তব্য রাখেন। সেভ এডুকেশন কমিটির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি সৌরভ মুখার্জী বক্তব্য রাখেন। সমগ্র সিকিমকে কার্যত একটি এসইজেড-এ পরিণত করে কী ভাবে শ্রমিক-কর্মচারীদের প্রচলিত শ্রম-আইনের ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সে প্রসঙ্গে তিনি আলোচনা করেন।

এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং পাওয়ারমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক কমরেড সমর সিনহা তাঁর বক্তব্যে ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষের উপরে ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। সভায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। পরিশেষে প্রশাসনের

সিকিম

নানাবিধ বাধাকে উপেক্ষা করে মে দিবসের সভাকে সফল করার জন্য কমরেড জংবাহাদুর ছেত্রী ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন।

জলপাইগুড়িতে মিড ডে মিল কর্মীদের ব্লক সম্মেলন

মিড ডে মিল কর্মীদের বারো মাসের বেতন, সরকারি কর্মীর স্বীকৃতি, ন্যূনতম মাসিক বেতন ১৫ হাজার টাকা, অবসরকালীন ৫ লক্ষ টাকা ভাতা সহ ১৩ দফা দাবিতে ৫ মে সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সমাজপাড়ার স্টুডেন্ট হেলথ হোমে জলপাইগুড়ি সদর ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন শীলা পাল। বক্তব্য রাখেন মমতা রজক, কাকলি রায় সহ আরও অনেকেই। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা কর এবং এআইইউটিইউসি-র জেলা সভাপতি জীবন সরকার। দাবিগুলি নিয়ে ১৭ জুন হাজার হাজার মিড ডে মিল কর্মীদের নবান্ন অভিযানের আহ্বান জানানো হয়। শীলা পালকে সম্পাদিকা এবং মমতা রজককে সভাপতি করে মোট ৪০ জনের কমিটি গঠিত হয়। সম্মেলনের শেষে একটি সুসজ্জিত মিছিল জলপাইগুড়ি শহর পরিক্রমা করে।

ভ্রম সংশোধন

গণদাবী ৭৭-৩৯ সংখ্যায় 'মে দিবসে দেশে দেশে তুমুল বিক্ষোভ' লেখায় আটের পাতায় ভুলক্রমে 'সঠিক নীতির ভিত্তিতে'-র পরিবর্তে 'সঠিক নীতির বিরুদ্ধে' ছাপা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত।

এ আই ডি এস ও-র নেতৃত্বে
বিকাশ ভবনে তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থা রক্ষার দাবিতে ১৩ মে রাজ্যের শিক্ষা দপ্তর বিকাশ ভবনে প্রবল বিক্ষোভ দেখায় এ আই ডি এস ও। ৬০০-র বেশি ছাত্র-ছাত্রীর এই বিক্ষোভে পুলিশ বাধা দিলে ধস্তাধস্তি শুরু হয়। প্রায় দু'ঘণ্টা বিকাশ ভবনের গেট অবরুদ্ধ করে চলে বিক্ষোভ। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিৎ রায়।

তিনি বলেন, দুর্নীতিমুক্ত নিয়োগ অবিলম্বে শুরু না হলে আরও হাজার হাজার স্কুল নতুন করে বন্ধ হয়ে যাবে। কলেজ স্তরে ভর্তি অবিলম্বে শুরু করা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন অবিলম্বে করা, থ্রেট কালচার বন্ধ করা ও কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি এই রাজ্যে চালু না করার দাবি জানান তিনি। রাজ্য সরকারের শিক্ষার বেসরকারিকরণের প্রচেষ্টার তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। প্রবল বিক্ষোভের চাপে শিক্ষা দপ্তরের সচিব সংগঠনের রাজ্য কোষাধ্যক্ষ সুরজিৎ সামন্তের নেতৃত্বে চারজনের প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করেন। তাঁরা গোটা রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার ভগ্নদশা তুলে ধরেন। সচিব বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দেন।

ছ'শোর বেশি স্কুল শিক্ষকবিহীন, শূন্য ৫৬ হাজার শিক্ষকপদ
ছত্তিশগড় জুড়ে ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ

কয়েক শত সরকারি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে এবং সমস্ত শূন্য পদে অবিলম্বে পূর্ণ সময়ের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী নিয়োগের দাবিতে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছত্তিশগড় জুড়ে বিক্ষোভে সামিল হলেন ছাত্রছাত্রীরা। সম্প্রতি ছত্তিশগড় সরকার এক সার্কুলার জারি করে প্রাথমিক স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক ও ৬০ জন ছাত্র পিছু একজন সহকারী শিক্ষক এবং মাধ্যমিক স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক ও ১০৫ জন ছাত্র পিছু তিনজন সহকারী শিক্ষক থাকবে বলে ঘোষণা করেছে। এর আগের সরকারি সার্কুলারে প্রাথমিক স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক ও প্রতি ৬০ জন ছাত্র পিছু দু'জন সহকারী শিক্ষক, মাধ্যমিক স্কুলে একজন প্রধান শিক্ষক ও ১০৫ জন ছাত্র পিছু চারজন সহকারী শিক্ষক থাকার উল্লেখ ছিল। এমনিতেই রাজ্যের ৪৫৯৫টি স্কুল বাড়ি ভাঙাচোরা অবস্থায় রয়েছে, ৫৩৯২টি সরকারি স্কুলে শিক্ষক সংখ্যা কেবলমাত্র একজন, ৬১০টি স্কুল শিক্ষকবিহীন, ৫৬ হাজার ২৩২টিরও বেশি শিক্ষক পদ শূন্য। প্রয়োজন যখন ছিল পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শূন্যপদে নিয়োগ এবং নতুন পদ সৃষ্টি করে সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে রক্ষা করার, তখন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পদ বিলোপ করে বাস্তবে সরকারি স্কুলগুলিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেওয়া হল। এর আগে ২০২৪ সালে রাজ্য সরকার একই পরিকল্পনা করেও ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকদের ব্যাপক বিক্ষোভের চাপে পড়ে পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এবারেও শিক্ষা ধ্বংসকারী এই সরকারি নীতির বিরুদ্ধে দুরগ, রায়পুর, ধমতরী, গরিয়াবান্দ এবং বিলাসপুরে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে ছাত্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। জেলায় জেলায় পোড়ানো হয় সরকারি সার্কুলার, জেলাশাসকের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে স্মারকলিপি পাঠানো হয়।

ধমতরি

দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণবিক্ষোভে উত্তাল সার্বিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অন্যতম দেশ সার্বিয়ায় কয়েক মাস ধরে চলছে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন। রাজধানী বেলগ্রেড সহ নানা শহরে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছেন হাজার হাজার মানুষ। ছাত্রদের নেতৃত্বে সে দেশের জনসাধারণের এই আন্দোলন চরম মাত্রায় পৌঁছয় গত ১২ এপ্রিল। ওই দিন দেশের দক্ষিণপন্থী সরকারের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার ভুসিক-এর অনুগামীরা পাল্টা মিছিল করলে ক্ষোভে ফেটে পড়েন এই বলকান দেশের জনগণ। ছাত্রদের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনে রাশ টানতে এই পাল্টা মিছিলের আয়োজন করেছিল সরকার পক্ষ।

আন্দোলনের সূত্রপাত গত নভেম্বরে। সার্বিয়ার এক রেল স্টেশনের শেড ভেঙে ১৬ জন মানুষের মৃত্যুতে সরকারের বিরাট দুর্নীতি প্রকাশ্যে আসে। একদিকে প্রেসিডেন্ট ভুসিকের স্বৈরাচারী ভূমিকার বিরুদ্ধে, অন্যদিকে এই যথেচ্ছ দুর্নীতির তদন্তের দাবিতে দেশজোড়া আন্দোলনে সামিল হন সাধারণ মানুষ। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা। ছাত্রদের আন্দোলনে বিপুল সমর্থন জানান কৃষকরা, সমর্থন জানান বিচারপতি, আইনজীবী, অভিনেতা থেকে শুরু করে সমাজের প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ। প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার সেই আন্দোলন কড়া হাতে দমনের চেষ্টা করেন। সরকারের সমালোচকদের, স্বাধীন সংবাদমাধ্যমগুলিকে দমন করতে শুরু করে স্বৈরাচারী সার্বিয়া সরকার। পুলিশ আন্দোলনকারী ছাত্র এবং জনসাধারণকে লাগাতার শাসানি দিতে থাকে। এর প্রতিবাদে ছাত্ররা ইউনিভার্সিটিতে ধর্মঘট ডাকলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেয় প্রশাসন। জানুয়ারি মাসে রাজধানী বেলগ্রেডে ছাত্র আন্দোলনের সমর্থনে ১০ হাজারের বেশি মানুষ রাস্তায় নেমে অবরোধ করে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধিকাংশ স্কুলের ছাত্ররা তাদের প্রতিষ্ঠানে ২ মাস ধরে প্রচার চালায়।

আন্দোলনের তীব্রতা দেখে সার্বিয়ার বিচারবিভাগ দুর্নীতির তদন্তে ১ জন মন্ত্রী ও বেশ কিছু সরকারি পদস্থ কর্তা সহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের 'অভাবে' পূর্তমন্ত্রী গোরান ভেসিক জেল থেকে ছাড়া পেয়ে যান। সরকারের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকায় ক্ষোভে ফেটে পড়ে ছাত্ররা। 'আমাদের শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে রক্ত রয়েছে দান করার জন্য'— রাজপথের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে সোচ্চার হয় তারা।

প্রশাসন বেলগ্রেডের সংসদ ভবন সহ প্রধান জায়গাগুলি বন্ধ করে দেয়, যাতে প্রতিবাদের আগুন আরও ছড়িয়ে পড়তে না পারে। জনসাধারণের দাবি মানা দূরের কথা, রাজধানীতে জাতীয়তাবাদী হাজার হাজার সমর্থকের জন্য নাচ-গানের আসরের মঞ্চ স্থাপন, তাদের জন্য অসংখ্য তাঁবু এবং খাবারের স্টলের ব্যবস্থা করে সার্বিয়া সরকার। প্রতিবেশী দেশ কসোভো ও বসনিয়া থেকেও কিছু মানুষ এতে যোগ দেন। আপাতদৃষ্টিতে প্রশাসনিক ভবন রক্ষা করার নামে প্রেসিডেন্টের প্রাসাদকে কেন্দ্র করে তার অনুগামীরা কয়েক ডজন ট্রাক্টর নিয়ে অবস্থান করে।

প্রেসিডেন্ট অনুগামীদের এই কর্মকাণ্ড দেখে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনকারীরা প্রবল ক্ষোভে ফেটে পড়ে। আন্দোলনকারী ছাত্ররা দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন আরও জোরদার করার অঙ্গীকার নেয়।

সমাজতান্ত্রিক শিবিরের পতনের পর পূর্ব ইউরোপ 'গণতন্ত্রের স্বর্গ' হয়ে উঠেছিল বলে কিছুদিন আগেও গলা ফাটাচ্ছিল পুঁজিবাদী প্রচারকরা। অথচ দেখা যাচ্ছে একদিকে পুঁজিবাদী শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দিকে দিকে ফেটে পড়ছে। অন্য দিকে সেই বিক্ষোভ দমন করতে তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' সরকারগুলোর পাশবিক নখ-দাঁত বেরিয়ে পড়ছে। সার্বিয়ার আন্দোলনেও দেখা গেল পুঁজিবাদী শোষণের বিরুদ্ধে মানুষ তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ছে সর্বশক্তি নিয়ে।

ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে বিজয়ের সংগ্রাম

তিনের পাতার পর

মধ্য দিয়ে, একই সাথে সে বলশেভিজমকে খতম করবে এবং সমগ্র রাশিয়াকে জার্মানির উপনিবেশে পরিণত করবে। জার্মান সামরিক শক্তির বৃহদংশ নিয়োজিত করা হল সোভিয়েটের বিরুদ্ধে। এই সময় জার্মান বাহিনী যদি পশ্চিম রণাঙ্গণে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর কাছে গুরুতর বাধা পেত, তবে হিটলারের পক্ষে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে অধিকাংশ শক্তি কেন্দ্রীভূত করা সম্ভব হত না। কিন্তু ব্রিটেন ও আমেরিকা পশ্চিমে হিটলারের বিরুদ্ধে কোনও কার্যকরী পাল্টা আক্রমণ বা যুদ্ধই করেনি। ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের এই চরিত্র ও সম্ভাব্য ভূমিকা হিটলারের অজানা ছিল না। সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে জার্মানি আক্রমণ করলে ব্রিটিশ ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সোভিয়েটের ধ্বংসই চাইবে, এ কথা বুঝেই হিটলার পশ্চিম ছেড়ে এসে পূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে প্রায় সব শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই আক্রমণের তিন বছর পর যখন মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট লালফৌজের হাতে জার্মান ফ্যাসিস্ট বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায়, একমাত্র তখনই ১৯৪৪ সালের জুন মাসে, অর্থাৎ বার্লিন দখলের মাত্র ১০ মাস আগে, ব্রিটিশ-মার্কিন সরকার ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খুলেছিল। এ ক্ষেত্রেও তাদের লক্ষ্য ছিল, লালফৌজের আগে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী দিয়ে বার্লিন দখল করে যুদ্ধজয়ের গৌরব থেকে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে বঞ্চিত করা। কিন্তু মহান স্ট্যালিনের রাজনৈতিক-সামরিক প্রজ্ঞা ও দূরদৃষ্টি, অভূতপূর্ব রণনীতি ও রণকৌশল এবং সোভিয়েট লালফৌজ ও জনগণের অপরিসীম বীরত্ব ও আত্মত্যাগ ইঙ্গ-মার্কিন চক্রের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছিল। ৩০ এপ্রিল ও ২ মে বার্লিনে রাইখস্ট্যাগের মাথায় লাল পতাকা ও সোভিয়েট রণপতাকা উড্ডীন করেছিল লালফৌজ। সমগ্র বিশ্বের জনগণের কাছে প্রমাণিত যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দুর্ধর্ষ জার্মান সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করে মানবজাতিকে ফ্যাসিস্ট শক্তির ধ্বংসলীলা থেকে রক্ষার প্রধান কৃতিত্ব ও গৌরব সর্বহারার মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েট লালফৌজ ও সোভিয়েট ইউনিয়নের জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে উন্নত সমাজতান্ত্রিক আদর্শে ঐক্যবদ্ধ বীর জনগণেরই প্রাপ্য এবং এটা তারা পেরেছে উন্নততর সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্যই যা পুঁজিবাদী সংকট থেকে মুক্ত ছিল।

এ জন্য কী অসীম মূল্য সোভিয়েট জনগণকে দিতে হয়েছিল, তা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ১৯৪৩ সালের নভেম্বরে মোট ৩২০ ডিভিসন জার্মান সৈন্যের মধ্যে একমাত্র পূর্ব রণাঙ্গনেই ২০৬ ডিভিসন জার্মান সৈন্য লালফৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। ১৯৪৪ সালের জুন মাসে পশ্চিম ইউরোপে দ্বিতীয় রণাঙ্গন খোলার সময়েও ১৫৭ ডিভিসন জার্মান সৈন্য ছিল পূর্ব রণাঙ্গনে। ১৯৪৫ সালে এই সংখ্যা ছিল ১৩০ ডিভিসন। বাকি ডিভিসনগুলি ছিল ব্রিটেন, ইটালি ও আটলান্টিকে ছড়িয়ে। এই সৈন্য সংখ্যাই বলে দেয় যে, জার্মান সমরশক্তির বিরুদ্ধে আসল লড়াই করেছিল লালফৌজ এবং ইউরোপের যুদ্ধের এটাই ছিল মর্মকথা। এই ভয়াবহ লড়াইয়ে ২ কোটি রুশ জনগণ প্রাণ দিয়েছিল, লক্ষ কোটি ঘরবাড়ি ও খামার ধ্বংস হয়েছিল। ইউরোপীয় রাশিয়ার এক-তৃতীয়াংশ জমি যার মধ্যে শিল্পাঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল, ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এমন একটি পরিবার ছিল না, যার কেউ না কেউ যুদ্ধে প্রাণ দেয়নি। এমন অপরিমেয় আত্মত্যাগের বিনিময়েই সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়ন গোটা মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল। মহান স্ট্যালিনের নেতৃত্বে এই জয় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ও সাম্যবাদী আদর্শের জয় ছিল বলেই তা দুনিয়া জুড়ে স্বাধীনতার আন্দোলন ও শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনে অভূতপূর্ব জোয়ার সৃষ্টি করে দিয়েছিল যা দেখে ভীত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই সোভিয়েট বিরোধী ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা করেছিল। কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার ছড়ানোর জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং প্রচারশক্তিকে নিযুক্ত করেছিল।

ফ্যাসিবাদ এখন পুঁজিবাদের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য

শুধু তাই নয়, দুদিন আগেও যে ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলি গণতন্ত্রের ধ্বজা উড়িয়েছিল, যুদ্ধ শেষ হতেই নিজ নিজ দেশে শ্রমিক আন্দোলন থেকে পুঁজিবাদকে রক্ষা করতে সেই ফ্যাসিবাদকেই তারা ভিন্ন রূপে কায়েম করল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হল ফ্যাসিবাদ। এ দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান-ইটালি-জাপান ফ্যাসিস্ট চক্রের সামরিক ভাবে পরাজয় ঘটেছে ঠিকই, কিন্তু তার থেকে এ রকম সিদ্ধান্ত করা ভুল যে, ফ্যাসিবাদ দুনিয়া থেকে মুছে গেল। বরং ঘটনা এই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যখন তৃতীয় তীব্র সাধারণ বা সামগ্রিক সংকটে পড়েছে, তখন প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের শাসন ব্যবস্থায় ফ্যাসিবাদ স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে পরিণত হবে। সাথে সাথে তিনি আরও বলেন যে, ফ্যাসিবাদকে কেবল একটি অত্যাচারী নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মনে করা ভুল হবে। জনগণকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করা ফ্যাসিবাদের একটি অন্যতম হাতিয়ার। তাই সমগ্র বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি ও জনগণকে এ সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হয়ে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে দর্শন-আদর্শ-সংস্কৃতি প্রভৃতি সকল দিক জড়িয়ে সংগ্রাম গড়ে তুলতে হবে।

আজ আমরা যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট সামরিক শক্তির পরাজয়ের ৮০তম বর্ষ পূর্তি উদযাপন করছি, তখন আমাদের দেশ সহ বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলির আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ও সমগ্র বিশ্বের সাধারণ পরিস্থিতি থেকে কি এই সত্যই স্পষ্ট নয় যে, সমগ্র মানবসভ্যতা আজ, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের ভাঙনের পর ফ্যাসিবাদের গভীরতর বিপদের সম্মুখীন? সোভিয়েট ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ভাঙনের পর বিশ্বে পুঁজিবাদী বাজার ভৌগলিক দিক থেকে বিস্তার লাভ করলেও, তার দ্বারা পুঁজিবাদের মৌলিক সংকট দূর হয়নি, বরং সমগ্র পুঁজিবাদী বাজারের অন্তর্নিহিত তীব্র সংকটের আসল কদর্য চেহারাটাই এখন বাইরে ফুটে বেরিয়েছে। পাশাপাশি, শ্রমিক-জীবনে বেকারি ও মজুরি হ্রাস, শ্রম-সময় বৃদ্ধি, অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়ার ঘটনা এখন বিশ্বের প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশেই ব্যাপক রূপ নিয়েছে। ফলে শ্রমিক বিক্ষোভও বাড়ছে। এমনকি পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শ্রমিক শ্রেণি, যাদের ওই সব দেশগুলির শাসক শ্রেণি বিশ্ব লুঠ করা অর্থের জোরে এতকাল কিছু কিছু ঘুষ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, এখন পুঁজিবাদী সংকটের ধাক্কায় সেই শ্রমিক শ্রেণিরও ঘুম ভাঙছে, তারাও পথে নামছে, ধর্মঘট করছে। ইউরোপ জুড়ে দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলনের ঢেউ উঠছে। ভারতের মতো পুঁজিবাদী দেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণি বিশ্ববাজারে প্রবেশের আকাঙ্খা ও চাহিদা থেকে বাইরের শক্তিমান সাম্রাজ্যবাদী লগ্নি পুঁজির সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে যে উদার আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে, তার চাপ পড়েছে ভারতের জনজীবনে। ছাঁটাই, বেকারি, মূল্যবৃদ্ধি ক্রমবর্ধমান।

পুঁজিবাদী বিশ্ব আজ তীব্রতর শোষণ ও যুদ্ধের গভীর বিপদের সম্মুখীন

এই পরিস্থিতিতে প্রতিটি পুঁজিবাদী দেশের শাসকরাই সংকট থেকে মুক্তি পেতে শ্রমিক শ্রেণির উপর যেভাবে আরও শোষণের খড়্গ নামিয়ে আনছে, তা চরিত্রে ফ্যাসিবাদী ছাড়া কিছু নয়। আবার আমরা জানি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তীব্র ব্যবসা সংকটে জর্জরিত ইটালি-জার্মানি ও জাপ পুঁজিপতি শ্রেণির উপনিবেশ দখলের উদগ্র চাহিদা এবং ব্রিটিশ, ফরাসি ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের নতুন উপনিবেশ দখলের তাগিদ— এই দুইয়ের সংঘাত থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি হয়েছিল। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে আমেরিকা, রাশিয়া, চিন, ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলি সহ সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী সব দেশই গুরুতর বাজার-সংকটে হাবুডুবু খাচ্ছে। প্যালেস্টাইনে ইজরায়েলের আক্রমণের পিছনে যেমন সমস্ত শক্তি নিয়ে আমেরিকা দাঁড়িয়ে রয়েছে তেমনই ভারতের মতো বহু দেশই এই যুদ্ধে অস্ত্র ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের দ্বারা মুনাফা লুটছে। একই ভাবে ইউক্রেন যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার উল্টো দিকে ইউক্রেনের পিছনে যেমন মার্কিন অস্ত্র এবং অর্থ কাজ করেছে তেমনই ইউরোপের প্রায় সব সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রই এই যুদ্ধে বিপুল বিনিয়োগের দ্বারা লাভবান হয়ে চলেছে। তেমনই মার্কিন-চিন বাণিজ্যযুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করেছে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলিই একদিন বাজার সংকট থেকে বাঁচতে যে বিশ্বায়নের নীতির আশ্রয় নিয়েছিল, তাতে সংকট তো মেটেইনি উপরন্তু তা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। তাই সেই বিশ্বায়নের নীতিকে তার প্রবক্তারাই আজ ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে, সবাই নিজ নিজ দেশে তথা বাজারে শুল্ক প্রাচীর তুলে বাঁচতে চাইছে। সম্প্রতি আমরা দেখলাম ভারত এবং পাকিস্তানের পুঁজিপতি শ্রেণির এই সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার মরিয়া চেষ্টায় কী ভাবে পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হল এবং দেশের জনগণের একটা অংশকে যুদ্ধোন্মাদনায় জড়িয়ে ফেলল।

তাই আজ বিশ্বের জনসাধারণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়ের ৮০তম বর্ষপূর্তি পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও যুদ্ধের বিপদ থেকে মুক্ত অবস্থায় পালন করছে না, বরং তারা এখন তীব্রতর শোষণ ও যুদ্ধের গভীর বিপদের সম্মুখীন। সর্বোপরি, বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের গুরুতর বিপর্যয়ে দেশে দেশে শ্রমিক শ্রেণি ও শোষিত জনগণের মধ্যে আদর্শগত বিভ্রান্তি শ্রমিক আন্দোলনের প্রধান দুর্বলতা রূপে কাজ করছে।

এই পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের সামরিক পরাজয়ের ৮০তম বর্ষপূর্তি উদযাপনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের শ্রমিক শ্রেণি যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যকার শ্রেণিসংগ্রামের লাইনকে, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের আদর্শগত লড়াইয়ের মর্মকথাকে ধরতে পারে এবং সেই অনুযায়ী শ্রেণি চেতনাকে উন্নত করতে পারে, তবে তার দ্বারাই শ্রমিক শ্রেণি আবার তাদের সংগ্রামের সঠিক পথ ও আদর্শের সন্ধান পাবে। একই ভাবে বর্তমান বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী, যুদ্ধবিরোধী জনগণ যদি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলিকে সঠিক ভাবে অনুধাবন করেন, তবে তাঁরাও দেখবেন যে, কমরেড স্ট্যালিনের নেতৃত্বে বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের জয়যাত্রা ও দেশে দেশে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠার ফলেই সে দিন যুদ্ধের বিরুদ্ধে জঙ্গি শান্তি আন্দোলন গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল যা সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে অন্যতম কার্যকরী বাধা রূপে কাজ করেছিল। ফলে আজকের বিশ্বেও যদি বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের উপর সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসনকে রুখতে হয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে হয়, তবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং সমগ্র বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী জনগণের ব্যাপকতম অংশকে জড়িত করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শান্তি আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। আমরা আশা করি বিশ্বের সর্বত্র শ্রমজীবী ও যুদ্ধবিরোধী জনগণ এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয় এর ৮০তম বার্ষিকী উদযাপন করবেন।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানে কাজের ধীর গতিতে ক্ষুব্ধ মানুষ

স্থায়ী বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য 'ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান' রূপায়ণের প্রথম পর্যায়ের কাজের প্রস্তুতি কয়েক মাস আগে থেকে চলছে। বর্ষার আগে ওই কাজের গতি বাড়িয়ে দ্রুত পূর্ণাঙ্গ প্রকল্পের কাজ শুরু করার দাবিতে ৩০ এপ্রিল ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সেচ দপ্তরের এসডিও-র কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে রূপনারায়ণ ও শিলাবতী নদীবাঁধের কৈজুরী, কুমারচক, জোতকানুরামগড়, রানিচক, কাটান গোবিন্দপুর প্রভৃতি স্থানে নতুন স্লুইসগেট নির্মাণ চলছে। বাস্তবে ওই নির্মাণ কাজ ছাড়া কোথাও এখনও মাস্টার প্ল্যানের কোনও কাজ শুরু হয়নি। বর্ষার আর মাত্র এক মাস কয়েক দিন বাকি। প্রথম পর্যায়ে দরকার ছিল, শিলাবতী নদীর নিম্নাংশ পুনঃখনন, যা আজও শুরু হয়নি।

২০ মে সাধারণ ধর্মঘট সফল করুন

একের পাতার পর

ক্ষেত্রের অসংগঠিত শ্রমিকদের জন্য ‘ওয়েলফেয়ার বোর্ড’ গঠন করতে হবে এবং তাদের সকলের ‘সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা’ সুনিশ্চিত করতে হবে, সমস্ত গিগ কর্মীদের শ্রমিকের স্বীকৃতি দিয়ে শ্রম আইনের আওতায় আনতে হবে, সকল বেকারের চাকরি অথবা যতদিন চাকরি না হচ্ছে ততদিন পর্যাপ্ত বেকার ভাতা দিতে হবে, কর্মসংস্থানের অধিকারকে সংবিধানে মৌলিক অধিকারের মান্যতা দিতে হবে, কর্মক্ষেত্রে ট্রেড ইউনিয়নের অধিকার এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুনিশ্চিত করতে হবে।

এই সাধারণ ধর্মঘটের দাবি— খাদ্য, ওষুধ, গ্যাস, পেট্রল সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনে ৭০০-র বেশি কৃষকের জীবনদান এবং আরও অজস্র কৃষকের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শক্তিতে বাতিল হওয়া ৩ কালা কৃষি আইনকেই ঘুরপথে ‘ড্রাফট ন্যাশনাল পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক অন এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং’ রূপে চালু করার জঘন্য চক্রান্ত সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে হবে। ‘C2 + 50%’ ফর্মুলার ভিত্তিতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) চালু করতে হবে। ধর্মঘটে দাবি উঠছে— শিক্ষা ব্যবস্থার সামগ্রিক কেন্দ্রীকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ এবং সাম্প্রদায়িকীকরণ করার হীন চক্রান্ত নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, নারীদের ওপর আক্রমণ ও নির্যাতন বন্ধ করতে হবে, নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, অশ্লীলতা, মদ ও মাদক দ্রব্যের সম্প্রসারণ রোধ করতে হবে। যে ভাবে মোবাইলের প্রতি আসক্তি, যৌন আসক্তি ইত্যাদি সমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছে এবং মানুষকে মনুষ্যত্বহীন করে তুলছে তা রুখতে হবে। এই সমস্যা বিশেষ করে ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকট ভাবে দেখা দিচ্ছে, অবিলম্বে এই সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রুখতে সরকারকে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বন্ধুগণ, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ৭৮ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা এ কথা স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, বেঁচে থাকার ন্যূনতম দাবি আদায় করতে হলে মেহনতি জনতার সামনে শক্তিশালী সংগঠিত ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। ভারত একটি তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশ হলেও মুষ্টিমেয় ধনী এবং অসংখ্য দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য বাড়তে বাড়তে এক ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশের হাতে জমা হয়েছে শ্রমজীবী মানুষের কঠিন শ্রমের ফসল দেশের ৭০ শতাংশ সম্পদ, অথচ এই সম্পদের মাত্র ৩ শতাংশের ওপর নির্ভর করে দিন কাটাচ্ছে দেশের ৫০ শতাংশ মানুষ।

এই সংকটময় পরিস্থিতির মোকাবিলায় সাধারণ ধর্মঘটের ঘোষণা এক বিশেষ তাৎপর্য নিয়ে এসেছে। শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হলে মেহনতি জনতার সংগ্রামী ঐক্য প্রয়োজন— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে শ্রমিক, খেতমজুর, গরিব চাষি, গ্রাম ও শহরের মধ্যবিত্ত, সাধারণ মানুষের সংগ্রামী ঐক্য একান্ত প্রয়োজন। শাসক পুঁজিপতি শ্রেণির স্বার্থে ও তাদের বিপুল মুনাফা অটুট রাখতে তাদের সেবাদাস সরকার, প্রশাসন ধারাবাহিক ভাবে চেষ্টা করে চলেছে এই ঐক্যকে ভেঙে দিতে। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের অবশ্যকর্তব্য এই সংগ্রামী ঐক্যকে চোখের মণির মতো রক্ষা করা এবং আরও বলিষ্ঠ ভাবে গড়ে তোলা।

বন্ধুগণ, দেশের সাধারণ নাগরিকদের নিজেদের স্বার্থেই এ কথা উপলব্ধি করতে হবে যে, তাদের দেশপ্রেম এবং দেশের প্রতি আবেগকে উগ্র জাতীয়তাবাদী হাওয়া তুলে দেশের মেহনতি মানুষের ঐক্য ভাঙার কাজে শাসক শ্রেণি ব্যবহার করতে চাইছে। ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আগ্রাসী যুদ্ধ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদতপুষ্ট ইহুদিবাদী ইজরায়েলের প্যালেস্টাইনের ওপর আক্রমণ এবং দখলদারি এ কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে যে, যুদ্ধের দ্বারা কেবলমাত্র সাধারণ মানুষের জীবন-জীবিকা ধ্বংস হয়। আজকের দিনে পুঁজিবাদের যুদ্ধ পরিস্থিতি প্রয়োজন, তার প্রয়োজন ক্রমাগত চলতে থাকা আঞ্চলিক যুদ্ধ, যার মধ্য দিয়ে অর্থনীতির সম্পূর্ণ সামরিকীকরণ করা সম্ভব হবে, জীবনের প্রধান সমস্যাগুলি থেকে জনগণের দৃষ্টি সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হবে এবং এই সুযোগে মুষ্টিমেয় ধনকুবের গোষ্ঠী অবাধে মুনাফা লুঠতে পারবে। তাই আমরা সকল শ্রমজীবী মানুষ এবং সাধারণ জনগণের কাছে ঐকান্তিক আবেদন জানাচ্ছি— ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, অঞ্চল, জাতি ইত্যাদি নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান এবং বিভেদ সৃষ্টিকারী ও আন্দোলনবিরোধী সকল শক্তির ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করতে এগিয়ে আসুন। ২০ মে সাধারণ ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করে তুলুন। নিজেদের জীবন-জীবিকার ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য আরও বিস্তৃত, ঐক্যবদ্ধ, ধারাবাহিক এবং শক্তিশালী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করতে সচেষ্ট হোন।

জনগণের সংগ্রামী ঐক্য দীর্ঘজীবী হোক

দুনিয়ার মজদুর এক হও

চাই জনগণের ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য

দুয়ের পাতার পর

মতেই নয়, কারণ সারা দুনিয়া জুড়ে সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র এবং অর্থ নানা পথে তারাই জোগায়, আবার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধতার নামে দেশে দেশে তারা হস্তক্ষেপ করে এবং অস্ত্র বেচে। সন্ত্রাসবাদ নির্মূল হলে এই অস্ত্র ব্যবসার বাজারটাই যে ঘা খাবে! অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদীরাও একই রকম কাজ করে। এমনকি নিজের দেশেও সন্ত্রাসবাদী শক্তিকে নির্মূল করলে এই সব শাসকদেরই ক্ষতি। ভারত সহ অন্যান্য শক্তির ক্ষেত্রেও এই কথাটা প্রযোজ্য।

পহেলগাঁও হামলার পর দেখা গেল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং বামপন্থার বিরুদ্ধে আরএসএস-বিজেপির মদতপুষ্ট শক্তিগুলি অশালীন আক্রমণ চালিয়ে গেছে। এমনকি মহান মানবতাবাদী কবি নজরুলের কবিতাকেও অতি নিম্নরুচির আক্রমণ করেছে এই অসুস্থ মানসিকতার শরিক মানুষজন। কিন্তু এই সত্য কি কোনও সচেতন মানুষ অস্বীকার করতে পারেন যে, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে সবচেয়ে বেশি দরকার ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে দুই দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক যুক্তিবাদী মনন গড়ে তোলা। প্রয়োজন, ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-প্রাদেশিকতা নির্বিশেষে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের সমস্যা যে একই সেই বোধ গড়ে তোলা এবং তা সমাধানের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধভাবে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়া। এ কথা শুধু আমরাই বলছি না, যে কোনও যুক্তিবাদী মানুষই বলে থাকেন। ১৯৫০-এ মুম্বইয়ের ‘কারেন্ট’ পত্রিকায় ঔপন্যাসিক ও চিত্রনাট্যকার খাজা মহম্মদ আব্বাস লিখেছিলেন, কাশ্মীরের কিছু মানুষ পাকিস্তানের ‘ইসলাম বিপন্ন’ স্লোগানে মাঝে মাঝে প্রভাবিত হলেও জীবনের বাস্তবতার বোধ থেকে তারা ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার দিকেই বেশি আকৃষ্ট হয়। ফলে ভারত সরকার যদি কাশ্মীরের মন জয় করতে চায়, তা হলে নীতিনিষ্ঠ ভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখাই তাদের কর্তব্য (রামচন্দ্র গুহ, গান্ধী উত্তর ভারত)। বাস্তব হল, একমাত্র এই কাজটা ছাড়া কোনও সামরিক তাকত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে অক্ষম। যারা ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বিষোদগার করায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাঁরাও আসলে ভালই জানেন যে, এই কাজটা করতে পারে একমাত্র যথার্থ বামপন্থী শক্তিই, তাই বোধহয় বামপন্থার বিরুদ্ধে তাঁদের এত বিষোদগার!

সন্ত্রাসবাদ এবং তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে যুদ্ধ যে সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে কত লোভনীয় তা এবারের ভারত-পাকিস্তান লড়াই চলাকালীন আবারও বোঝা গেল। যখন দেখা গেল চিন, রাশিয়া, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইজরায়েলের তৈরি নানা ধরনের অস্ত্র নিয়ে দুই পক্ষ লড়ছে। ভারতীয় ধনকুবেররাও এখন অস্ত্র ব্যবসায়ে যথেষ্ট এগিয়ে তারাও তাই উল্লসিত। যত সেই অস্ত্র ধ্বংস হয়েছে, তত অস্ত্র কোম্পানিগুলির শেয়ার বাজারের দর চড়চড় করে বাড়তে দেখা গেছে। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ঘনিষ্ঠ ধনকুবের আম্বানি গোষ্ঠী ‘অপারেশন সিন্দুর’ নামটির স্বত্ব কিনতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দেশের মানুষের প্রবল সমালোচনার ফলে তারা এর থেকে অবশ্য হাত গুটিয়ে নিয়েছে। দেখা গেল মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হঠাৎ পাওয়া সুযোগকে হাতছাড়া না করে কাশ্মীর সহ ভারত-পাকিস্তানের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থানকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধিতে নেমে পড়ল। সাম্রাজ্যবাদী চিনও তাই তড়িঘড়ি শান্তির পায়রা ওড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভারতের সাধারণ মানুষের কাছে আজ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রধান রাস্তা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে খেটে-খাওয়া মানুষের ঐক্য রক্ষা ও সমস্ত মৌলবাদী, সন্ত্রাসবাদীদের জনবিচ্ছিন্ন করা। পাকিস্তানের মানুষেরও আজ এটাই কর্তব্য। না হলে বারে বারে সাধারণ মানুষেরই প্রাণ যাবে, আর শাসকরা তা থেকে ফয়দা লোটার হিসাব কষবে।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি)-র দমদম আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক ও কলকাতা জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড রবীন রায় ১৩ এপ্রিল কলকাতার বি আর সিং হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁর মরদেহ কেন্দ্রীয় অফিসে আনা হলে শ্রদ্ধা জানান পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। এ ছাড়াও মাল্যদান করেন জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। প্রয়াত কমরেডের মরদেহ তাঁর কর্মক্ষেত্র দমদম আঞ্চলিক কার্যালয় হয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নিমতলা শ্মশানে।

কমরেড রবীন রায় (মঙ্কু) দমদমের ঘুঘুডাঙার বাসিন্দা ছিলেন। ১৯৬৮ সাল নাগাদ তিনি দলের সাথে যুক্ত হন। মা-ভাইদের দেখাশোনার জন্য তিনি রেলের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে ঐতিহাসিক রেল ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হন। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রের নতুন সরকারের সময় তিনি আবার চাকরি ফিরে পান। তাঁর মতো আরও যে সকল রেল-কর্মচারী চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছিলেন, তাঁদের আর্থিক সহায়তা দিতে এগিয়ে আসেন চাকরিরত অন্য সহকর্মীরা। তাঁরা চাঁদা তুলে সমস্ত চাকরিহারা কর্মচারীকে নিয়মিত মাসমাইনের টাকা জোগাতেন। কর্মচারী আন্দোলনে এটি ছিল এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। দমদমের তদানীন্তন আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সুব্রত দাসের মৃত্যুর পর এই দায়িত্ব পান কমরেড রবীন রায়। সারা দিন অফিসের কাজ শেষ করে তিনি লোকাল অফিসে ঢুকতেন।

লোকাল সম্পাদক হওয়ার পর রাজ্যে সিপিএম শাসনে প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন, বাসভাড়া বৃদ্ধি বিরোধী আন্দোলন সহ নানা আন্দোলনে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। দমদম এলাকার মানুষের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। ওই সময় আরও অনেক কমরেডের মতো পার্টির নির্দেশে নির্বাচনের সময় অফিস থেকে ছুটি নিয়ে বাইরের জেলায় চলে যেতেন। পরিবারের সদস্যদের, বিশেষ করে ছোট ভাইকে দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত করার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। বয়সজনিত কারণে তিনি দীর্ঘদিন অসুস্থ ছিলেন। কমরেড রায় ছিলেন অমায়িক আচরণের উন্নত মূল্যবোধের একজন মানুষ। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি পার্টির আদর্শকে বুকে বহন করেছেন। পিতার মতো স্নেহ-ভালোবাসায় কমরেডদের দেখাশোনা করতেন। তাঁর কোমল স্বভাবের জন্য পার্টি কর্মী, সমর্থক সহ এলাকার মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। ৫ মে উত্তর কলকাতার ‘আস্থা’ হলে তাঁর স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক কমরেড সুব্রত গৌড়ী এবং রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড দীপক দেব। সভাপতিত্ব করেন জেলা কমিটির সদস্য কমরেড সত্যেন ভট্টাচার্য।

কমরেড রবীন রায় লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2025-27

গণদাবী GANADABI Volume: 77, No.: 40 Bengali Weekly May 16, 2025 Kolkata Price: Rs. 3.00

মদ-ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের গঙ্গারামপুরে

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বাগধারা পঞ্চগ্রামে মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ৮ মে গঙ্গারামপুর থানায় মদ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে এফআইআর দায়ের করা হল। বেশ কিছুদিন ধরে কমিটির পক্ষ থেকে এলাকায় মদ বন্ধের দাবিতে আন্দোলন চলছিল। থানা, আবগারি দফতর, পুলিশ ফাঁড়ি, এমনকি এসপি-র কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এসপি-র হস্তক্ষেপে আবগারি দফতরের কর্মীরা একদিন গিয়ে মদের ভাটির একটি অংশ ভেঙে দেওয়া সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যে আবার রমরমিয়ে ব্যবসা চলতে থাকে। আন্দোলন আরও তীব্র হলে এ দিন সকালে আবগারি এবং থানার কর্মীরা মিলে গোটা ভাটি ভেঙে দেয়। এর পর মদ-ব্যবসায়ীরা আন্দোলনকারী মহিলাদের প্রচণ্ড মারধর করে। থানায় দুষ্কৃতকারী মদ-ব্যবসায়ীদের শাস্তির দাবিতে অভিযোগ জানিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

কোচবিহারে কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ককর্মীদের বিক্ষোভ

দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ না করানো, ১৬ জন হাউস কিপিং স্টাফের অন্যায় বদলি রদ, ওয়েস্ট বেঙ্গল শপ অ্যান্ড এস্ট্যাবলিশমেন্ট অ্যাক্ট ১৯৬৩ অনুযায়ী বছরে ৩১ দিন ছুটি, ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাস সহ আরও কিছু সমস্যা সমাধানের দাবিতে কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের পক্ষ থেকে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার কোচবিহার রিজিওনাল অফিসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি হয়।

দীর্ঘক্ষণ ধরে সেখানে স্লোগান চলার পর এআইইউটিইউসি-র কোচবিহার জেলা সম্পাদক ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেখা করেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বলেন, এই দাবিগুলির অধিকাংশের নিষ্পত্তি তাঁর ক্ষমতার বাইরে। ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের পরামর্শের ভিত্তিতে তিনি এ ব্যাপারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কলকাতার লোকাল হেড অফিসের সঙ্গে কথা বলার জন্য সময় চেয়ে নেন। কথা বলার পর তাঁরা আবার সংশ্লিষ্ট ভেন্ডার তথা ঠিকাদারদের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক করেন।

কিছু সমস্যার সমাধান হয়, কিছু সমস্যা সমাধানের আশ্বাস পাওয়া যায়। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে দৃঢ়তার সাথে বলা হয় যে, সমস্যার সমাধান না হলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলন হবে। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন এআইইউটিইউসি-র সহ-সভাপতি তথা এআইবিইইউএফ-এর সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল, এআইইউটিইউসি-র কোচবিহার জেলা সম্পাদক নেপাল মিত্র, কন্ট্র্যাকচুয়াল ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের সহ সম্পাদক মণিলাল রবিদাস প্রমুখ।

কোচবিহারে আশাকর্মীদের সম্মেলন

শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি সহ নানা দাবিতে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের কোচবিহার জেলার সাধারণ সভা ২৮ এপ্রিল কোচবিহার শহরের সুকান্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন, জেলা সভাপতি শিপ্রা দে তালুকদার, জেলা সম্পাদিকা রীনা ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন রোধ ও কাজের দাবিতে নদিয়ায় যুব সম্মেলন

১১ মে এআইডিওয়াইও নদিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলা প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পলাশি দক্ষিণপাড়া হলে। সম্মেলন উদ্বোধন করেন এস ইউ সি আই (সি) নদিয়া (উত্তর) সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কমরেড মহিউদ্দীন মান্নান। বক্তব্য রাখেন এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অশোক মাইতি ও রাজ্য কোষাধ্যক্ষ কমরেড সঞ্জয় বিশ্বাস। কমরেড আনারুল হককে সভাপতি, কমরেড সেলিম মল্লিককে সম্পাদক ও কমরেড সাকিল সেখকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৮ জনের জেলা কমিটি ও ২০ জনের জেলা কাউন্সিল গঠিত হয়। সম্মেলনে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারকেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করা, সমস্ত বেকার যুবকদের কাজ দেওয়া ও কাজ না দেওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা দেওয়া, মোবাইল রিচার্জের বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহার, মদ, জুয়া, সাট্টা, অপসংস্কৃতি রোধ করে নারীর সম্ভ্রম রক্ষা করা, বাতিল হওয়া ২৬ হাজার যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরি ফিরিয়ে দেওয়া, কাশ্মীরের পহেলগাঁও সহ যে কোনও সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি ওঠে।

সম্মেলনে শতাধিক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। শেষে যুবজীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দাবি নিয়ে পলাশি বাজারে সুসজ্জিত বিক্ষোভ মিছিল হয়।

ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে ঝাড়গ্রাম জেলা গণকনভেনশন

২০ মে ১০টি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন এবং জাতীয় ফেডারেশনগুলির আহ্বানে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনস্বার্থবিরোধী নীতিগুলির প্রতিবাদে শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী চারটি শ্রম কোড বাতিল সহ ১৭ দফা দাবিতে সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘটের সমর্থনে ৩ মে ঝাড়গ্রাম জেলা যুক্ত ট্রেড ইউনিয়নগুলির আহ্বানে গণকনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় ঝাড়গ্রাম শহরে। সভাপতি ছিলেন প্রদীপ সরকার। বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসির পক্ষে গৌরীশঙ্কর দাস, এআইটিইউসি-র পক্ষে গুরুপদ মণ্ডল এবং সিআইটিইউ-এর পক্ষে পার্থ যাদব। এ ছাড়া ১২ জুলাই কমিটির নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিলে নতুন করে নির্বাচনের দাবি এসডিএফ-এর

পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল নির্বাচনে চূড়ান্ত জালিয়াতির বিরুদ্ধে এসডিএফ-এর দায়ের করা মামলায় ৬ মে হাইকোর্টে শুনানি হয়।

২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ মেডিকেল কাউন্সিল নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের মদতপুষ্ট ডাক্তার প্যানেল ছাপ্পা ভোট, জাল ব্যালট তৈরি করা সহ বিভিন্নভাবে কারচুপি চালায়। নির্বাচনের আগে এবং নির্বাচন চলাকালীন থ্রেট করে চিকিৎসকদের কাছ থেকে ফাঁকা ব্যালট নিয়ে নেওয়া হয়। প্রতিবাদ জানিয়ে সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম নির্বাচন বয়কট করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। এ দিনের শুনানিতে বিচারপতি পার্থসারথী চট্টোপাধ্যায় বলেন, ইতিপূর্বে যেসব ব্যালট তুলে এনে কোর্টের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছিল সেগুলিকে পর্যবেক্ষণে নিতে হবে। মেডিকেল কাউন্সিলকে দু'সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়েছে।

এসডিএফ-এর পক্ষ থেকে বলা হয় মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তীর নির্বাচন পরিচালনা করার কোনও এক্তিয়ার থাকতে পারে না। কারণ তিনি নির্বাচনের আগেই অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর এক্সটেনশনের অর্ডারও ছিল অবৈধ। ফলে অবৈধ একজন নির্বাচন আধিকারিকের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন কীভাবে বৈধ হতে পারে! এই অবস্থায় সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম এই অবৈধ কাউন্সিল ভেঙে দিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নতুন করে নির্বাচন করার দাবি জানিয়েছে।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed by Soumen Basu at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com